

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 753 - 764

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মালদহ জেলার ঐতিহ্যশালী লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা উৎসব ও গম্ভীরা পালা গান

অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: sksahaugb@gmail.com

ও

চন্দনা মন্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: sarkarchandana11@gmail.com

0009-0003-6629-6086

Received Date 20. 01. 2026**Selection Date 10. 02. 2026****Keyword**

Gambhira festival, Chaitra Sankranti, Tal, Diar, Barind, Ahara Puja, Gambhira folk song, Ghat Bhara, Chhoto Tamasha, Neighborhoods.

Abstract

Gambhira is a traditional folk culture of Malda district. The Gambhira festival has been prevalent in Malda since ancient times. The Gambhira festival is celebrated in all three regions of Malda: Tal, Diar, and Barind. While the Gambhira festival is primarily celebrated during Chaitra Sankranti (the last day of the Bengali month of Chaitra), in some areas it is also celebrated in the months of Baishakh, Jyeshtha, and even Asharh. To preserve this ancient tradition, the Gambhira festival is celebrated annually as a grand festival in various areas of Old Malda, including Phulbari, Mokhatipur, Rajak Para, Kuttipara, Tarapur, Phulbaria, Jotpur, and Bachamari. The Gambhira festival has four stages: Ghat Bhara (filling the pot), Chhoto Tamasha (small performance), Boro Tamasha (large performance), and Ahara Puja (a specific ritual). During this festival, Gambhira songs are performed in different neighborhoods. The songs performed during this time primarily focus on social and family issues. Thus, Gambhira folk songs are a part of the Gambhira festival. When Gambhira songs are performed outside the festival context, they highlight social, family, and political problems and suggest solutions. Gambhira songs are a significant medium for conveying social messages. Currently, Gambhira songs have gained widespread popularity, extending beyond the Gambhira festival itself. They are not only popular in Malda district but have also gained international recognition. Currently, various documentaries are being made based on Gambhira, and Gambhira masks are used in various puja pandals and home decorations. While the Gambhira

festival has specific dates and auspicious times for its celebration, there are no such restrictions for performing Gambhira songs. Gambhira artists are fearless and possess a secular character. Gambhira folk songs once inspired freedom fighters. The British were wounded by the sharp, incisive words of these songs. Even today, on stage, Gambhira artists fearlessly and impartially use witty and humorous language to criticize wrongdoers and hypocritical individuals. Gambhira folk songs are usually sung in the regional dialect, making them easily understandable to ordinary people. Gambhira songs express their subject matter in a satirical manner, infused with simple and straightforward humor, something that is not comprehensively possible for any other folk medium. In this respect, Gambhira plays the role of a folk educator. Unlike other folk art forms, the subject matter of Gambhira is not fixed; it changes according to contemporary circumstances. During a Gambhira performance, the artists utilize their quick wit to spontaneously create Gambhira dialogues. Currently, through the organization of various workshops on Gambhira, the artists are making strenuous efforts to promote and propagate Gambhira collectively.

Discussion

মালদহের গম্ভীরা বিকাশের মূলে রয়েছে মালদহের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময়তা। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ইত্যাদি জেলাগুলো থেকে মালদহের জলবায়ুর একটা তফাৎ রয়েছে। মালদহ নদীকেন্দ্রিক জেলা। এখানে বেশ কয়েকটি নদী – গঙ্গা, ফুলহর, মহানন্দা, টাঙ্গন ইত্যাদি রয়েছে। মালদহ জেলাকে বরিন্দ্র, টাল, ও দিয়ারা নামে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। বরিন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে - গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদহের বিভিন্ন অঞ্চল। টাল অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে চাঁচোল, রতুয়ার এক নম্বর ও দুই নম্বর ব্লক, হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক। দিয়ারা অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, ইংলিশ বাজার।

প্রতিবছর বন্যার জলে নদী বাহিত পলি জমিতে জমায়েত হয়। ফলে মালদহের জমি ভীষণ উর্বর, এখানে প্রচুর ফসল ফলন হয়। মানুষের ঘরে অর্থের প্রাচুর্য না হলেও খাদ্যের অভাব কোনো দিন সেভাবে দেখা যায় না। মানুষ অনায়াসে তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে জীবনধারণ করতে পারে। ঘরে দশজন আগমন হলেও তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আজও গম্ভীরার আনন্দ, উৎসব, হাস্যরস উপভোগ করে। এই দৃশ্য আজও প্রত্যেক বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় ওল্ড মালদহের বিভিন্ন গম্ভীরা প্রাঙ্গণ তথা হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, রতুয়া ইত্যাদি জায়গার গম্ভীরা উৎসবে দেখা যায়। মালদহে বসবাসকারী জনজাতির হা—

“নাগর, চাঁয়, তিওর, রাজবংশী, পোলিয়া, দেশী, সদগোপ, গোয়ালা, ধানুক, চুনিয়া, নুনিয়া, দোহার, ডোম, হারি, মাহিষ্য, কৈবর্ত, কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, চামার, মাহালী, জেলে, তাঁতি, তুড়ি, নমঃশুদ্র, সাঁওতাল, বর্ণ হিন্দু ও অন্যান্যরা।”^১

মালদহ জেলার এই উৎসব সাধারণ জনগণের সংস্কৃতি বা লোকানুষ্ঠান হয়েও তার প্রকৃতির গুরুত্ব ও বিষয়ের গৌরবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। মালদহের কৃতি সন্তান অধ্যাপক বিনয় সরকারের ‘দা ফোক এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার’ (১৯১৭) বইটি ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎ মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। বিদেশের লাইব্রেরীতে গম্ভীরার উপস্থিতি দেখে অত্যন্ত আনন্দে গর্বিত হয়ে বিনয় সরকার যা উচ্চারণ করেছিলেন—

“যখনি দেখেছি বুকটা চেঁরে উঠেছে, আর তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি এ আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগবিজয়, মনে হয়েছে এ আমার পুরাটুলির দিগবিজয়। কল্পনা করেছি এ আমার এই আমার মালদহের দ্বিগবিজয়-আমার চুনিয়া, নুনিয়া ভাইদের দ্বিগ্বিজয়।”^২

গম্ভীরা উৎসব প্রচলনকাল : মালদহ জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তির সময় গম্ভীরা উৎসবের আচার অনুষ্ঠান ও পালা গান পরিবেশনার রেওয়াজ দেখা যায়। মূলত শিবকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব। কোনো কোনো অঞ্চলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এমনি আশাঢ় মাসেও গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে গম্ভীরা উৎসবের দিনগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভাজিত হয়ে থাকে। যেমন - আদ্যের গম্ভীরা বইটিতে গবেষক হরিদাস পালিত গম্ভীরা উৎসবের দিন বা অঙ্গ বিভাজনগুলি নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লেখ করেছেন-

“চৈত্র মাস যদি ৩০ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ৩০ তারিখে হইলে ২৬ তারিখে গম্ভীরার ঘট ভরা, ২৭ তারিখে ছোট তামাসা, ২৮শে বড় তামাশা, ২৯ এ আহারা বা চরক পূজা হইয়া থাকে।”^৭

দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরা উৎসব : অঞ্চল বিশেষে গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গের নাম ভিন্ন, এখানে দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরা উৎসবের প্রকৃতির বর্ণনা করা হল। দিয়ারা অঞ্চলের রতুয়া ব্লকের, বালুপুর কিষণ পাড়ার গম্ভীরা উৎসবের শিব পূজার আচরণীয় দিনগুলি -

- ক) প্রথম দিন - ঘট ভরা
- খ) দ্বিতীয় দিন - ফুল ভাঙ্গা
- গ) তৃতীয় দিন - কোপসারা
- ঘ) চতুর্থ দিন - হারনা হারনি

ক) ঘট ভরা : বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গম্ভীরা ঘট স্থাপনের ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। স্থানীয় পূর্ব প্রথা অনুসারে কোথাও চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন আগে, পাঁচ দিন আগে বা সাতদিন আগে ঘট ভরা হয়ে থাকে। বংশানুক্রমে যে সন্ন্যাসী ভক্ত হয়ে থাকে তারই হাতে ঘট ভরা কাজটি সম্পন্ন করা হয়। তবে ঘট ভরার আগে গ্রামের সকলের সর্ব সম্মতিক্রমে ঘট ভরার দিন ধার্য করে নিকটস্থ নদী, পুকুর, খাল বিল ইত্যাদিতে ঘট ভরা হয়। প্রথম ঘট ভরার দিন প্রধান সন্ন্যাসীর মুখে বান্দনা শোনা যায়-

“হরি বল রামমোদিলা কৃষ্ণ বলরাম
শিবকে জানাই দ্বন্দ্ববৎ গুরু খে ধ্যান
১৬০০ ভক্তের নামে জানাইছি হে প্রণাম।”^৮

গম্ভীরা গৃহে ঘট স্থাপনের সময় গঙ্গা স্তব করা হয়। সেই স্তবের মাধ্যমে গম্ভীরার জল, থল, মৃত্তিকা, সমস্ত দেব-দেবীর শুদ্ধ তার আরাধনা আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া হয়।

১. জল শুদ্ধ, থল শুদ্ধ, শুদ্ধ যেমন ধ্যান
শুয়া হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ গণেশের থান।
২. জল শুদ্ধ, থল শুদ্ধ, শুদ্ধ যেমন ধ্যান
শুয়া হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ শিবের থান।
৩. জল শুদ্ধ, থল শুদ্ধ, শুদ্ধ যেমন ধ্যান
শুয়া হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ পার্বতীর থান।”^৯

খ) ফুল ভাঙ্গা : এদিন ভক্তদের তিনটি অথবা পাঁচটি সিদ্ধিপাতা, ফুল, আনার রীতি। রাত্রি বেলা ভক্তরা ফুল ভাঙতে যাওয়ার আগে সারিবদ্ধ উপবিষ্ট হয়ে থাকে। মূল সন্ন্যাসী ভক্তদের গায়ে ফুল বেলপাতার জল ছিটিয়ে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে ও গা বন্ধ করে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে। ফুল ভাঙতে যাওয়ার সময় মূল গায়ের (মোড়ল বা মূল সন্ন্যাসী) বোলামে পাঠ করে। প্রশ্নোত্তর ভঙ্গিতে এই বোলামোগুলো গাওয়া হয়ে থাকে -

“ফুল ভাঙ্গিতে যাইবা তোমরা আপন আপন মনে।

পঞ্চ গাছের পঞ্চ ফুল চিনিবে কেমনে।। [২]

আহার ফুল ভাঙ্গিতে যাব আমরা আপন আপন মনে (২)

পঞ্চ গাছের পঞ্চ ফুল চিনিব নয়নে।।

ফুল ভাঙিতে যাবে তোমরা কালিদহের কুল। (২)

কাহার লাইগা ভাঙ ধুতুরা কাহার লাইগা ফুল।।

ফুল ভাঙ্গিতে যাব আমরা কালিদহের কুল। (২)

শিবের লাইগা ভাঙ ধুতুরা কালীর লাইগা ফুল।

ফুল ভাঙ্গিতে যাবে তোমরা সঙ্গে যাবে কে। (২)

বাসুয়া বাহনে শিব সঙ্গে স্যাজাছে।।”^৬

— এই গানের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, ভক্ত যখন যা চায় গায়ের মোড়ল তখন তার হাতে দা, ফুল ইত্যাদি ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর ভক্তরা ফুল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। ভক্তদের দ্বারা সংগৃহীত ফল-মূল-সিদ্ধিপাতা গভীর আর চালে ফেলার সময় দেড় কোটালের ছড়া—

“ফুল অমলা, ফুল কমলা, ফুল আমার যুঁথি

এখানে ছিল ফুল ফুল গেল কথি।।”^৭

গ) কোপসারা : গভীর উৎসবের তৃতীয় পর্বের নাম কোপসারা। এই দিন ভক্তরা দল বল সহকারে হাঁসুয়া, বর্ষা, ফলা, কাটারি, তরোয়াল, বল্লম নিয়ে কোপসারতে বের হয়। কোপসারার আগেই বিকেলবেলা মূল পূজা সম্পন্ন হয় হর গৌরির সম্মুখে। শুদ্ধি করণের পর থেকে পূজোর রাত্রি পর্যন্ত এ পর্বের সীমা। মূল পূজোর পর প্রতিমার সম্মুখে পুরোহিতের দ্বারা গভীর রাতেই কোপসারা সম্পন্ন হয়। কোপসারার বিশেষ বিধান এই যে একটি অফোঁটা (ফুল-ফলহীন) কলা গাছকে ধূপ সিঁদুর দিয়ে এক কোপে কেটে ফেলে মাটিতে না নামিয়ে নীল (চড়ক) থানে পোঁতা হয় আবার কোথাও কোথাও থানে অর্পণ করা হয়।

কোনো কোনো বোলামো পুনরায় কোপসারার দিন গাওয়া হয়ে থাকে। কোপসারার উদ্দেশ্যে ভক্তরা তৈরী হলে বোলামো গাওয়া হয় –

“তবে ঢাকো বাজে ঢোল বাজে জোরে বাজে কারা।

কোথায় আছো হে থামের মোড়ল ভক্ত চাহে খাড়া।।

তবে ঢাকো বাজে ঢোল বাজে লাগিয়ে মাশুল।

কোথায় আছো শিবের সন্ন্যাসী দিয়ে দেহ ফুল।।

তবে কেবা দিলো তার পাহুঁচি, চুড়িকেবা দিল নূপুর।

কেবা দিলে খাভাকাপড় কে বা দিল সিঁদুর।।”^৮

এই বোলামোয় ভক্তের হাতে মোড়ল খাড়া ফুল সিঁদুর ইত্যাদি ধরিয়ে থাকে।

রাত্রের অন্ধকারে ফুল ভাঙ্গতে বের হলে ঢাকিও ঢাক বাজাতে বাজাতে সঙ্গে যায়। তবে ভক্তরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা ভক্তরা ঢাকের বোল শুনে একত্রিত হয়। ঢাকিকে উদ্দেশ্য করে নিমজ্ঞ বোলামো গাওয়া হয়েছে—

“কোন বা কাঠের ঢাক তোমার কোন বা কাজে লাগে।

কাহারো হুকুমে ঢাক ঘারে চরে বাজে।।

আম কাঠের ঢাক আমার দেবো কাজে লাগে।

বুড়া শিবের হুকুম পেয়ে ঘারে চরে বাজে।।

ছুটিল শিবের ভক্ত হাতে লোহারকাতা।

ভূত প্রেতের নাগাল পেলে কেটে আনিও মাথা।।

ঢাকুয়া ভায়া ঢাক বাজারে তোর মা আমার মাসি।

উদাস সুরে বাজিয়ে যেও হে ফুল কুড়িয়ে আসে।”^{১৬}

-ঢাকীদের সঙ্গে নিয়ে ভূত প্রেইত মশাল রুপি ভক্তরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই গম্ভীরা তলায় এসে পৌঁছায়।

ভক্তরা হাতে নানা রকম কাটারি, ফল, ফুল নিয়ে গম্ভীরা তলায় আসে। হাঁটু পেতে গম্ভীরার সামনে বসে থাকে। এই অবস্থায় দেব কোটালের মুখে একটি বন্দনা শোনা যায়—

“তবে কুষ্ঠে হতে আইলা তোমরা হায়া আরো ধায়া।

কিসের লাগিয়া তোমরা আছে হে দাঁড়ায়া।।

স্বর্গ হতে আইলা তোমরা হয়ে আছে খাড়া।

বুড়া শিবের হুকুম পেয়ে বসিয়া যাও হে তোমরা।”^{১৭}

ফল, ফুল ভাঙ্গতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে ভক্তরা। সেই সমস্যা ভক্তরা কি ভাবে সমাধান করেছে, নিম্নোক্ত বোলামোর মধ্যে তা দেব কোটালের মুখে শোনা যায়। যথা -

“তবে ফুল তুলিতে গিয়েছিলে তোমরা আপন মনে।

পঞ্চ গাছে পঞ্চ ফুল চিনিবা কেমনে।।

তবে ফুল তুলিতে গিয়ে ছিলে তোমরা লতাপাতা

লতাপাতার মধ্যে ছিল ভাগনা বছর মাথা।।

ফুল তুলিতে গিয়েছি আমরা ছুইনি লতা পাতা।

ঢাকের বাড়িতে পালিয়ে গেলো ভাগনা বছর মাথা।”^{১৮}

রাতের অন্ধকারে গম্ভীরা পুজোর উদ্দেশ্যে শিব ভক্তরা ফুল, ফল, গুঁরমি কাঁটার গাছ নিয়ে আসে। দিয়ারা অঞ্চলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গুঁরমি কাঁটার গাছ জন্মায়। তবে ওল্ড মালদার গম্ভীরা তলায় পনিয়ালা নামে এক কাঁটা গাছ বিছানার মত করে পাতে। অর্থাৎ কাঁটা বিছানায় গ্রামের ছোট ছোট শিশু থেকে আবয়সী সকলেই গোর দেয়। বিছানা পাতার পর কোটালের মুখে পরবর্তী বোলামো শোনা যায় -

“বাপ মরেনি মা মরেনি

কাহারো হুকুমে হে তোমরা -

মা মরেনি বাপ মরেনি মরেনি রে কেউ

বুড়া শিবের হুকুম পেয়ে পিটিবে গোড়।

দুধ, দধি, ঘৃতমাখন ছানা।

কাহারো হুকুমে তোমরা পেয়েছো বিছানা

দুধ, দধি, ঘৃত মাখন ছানা।

বুড়া শিবের হুকুম পেয়ে ছাড়া হে বিছানা।

ই ডাল ভাঙ্গো উ ডাল ভাঙ্গো ভেঙ্গে করো সার

সাড়ের উপর চরে দেখো সাত সুমুদ্র পার।।”^{১৯}

কথিত আছে এই কাঁটার বিছানায় গোর দেওয়ার ফলে সারা বছরের মতো দেহের শুদ্ধিকরণ ঘটে। কোনোরকম ভূত প্রেতের আক্রমণ হয় না। এক গম্ভীরাভক্ত বালুপুর কিষণ পাড়ার নিবাসী স্কুল শিক্ষক প্রভঞ্জন মণ্ডল বলেন -

“কাঁটা বিছানায় গোর দিলে তাদের শরীর ও মনে কোনো কষ্ট হয় না, শিবের আশীর্বাদ থাকে। সারা বছরের জন্য দেহের শুদ্ধিকরণ হয় ও ভূত-প্রেত ধরেনা, গায়ের মধ্যে যদি কোনো কাঁটা ঢুকে থাকে, সেগুলো কয়েকদিন পর আপনা আপনি গা থেকে বেরিয়ে যাবে।”^{২০}

লক্ষীনাচ : স্ত্রী প্রাধান্য নাচ হলেও এখানে কোনো নারী নয়, পুরুষকেই লক্ষী সাজে সজ্জিত করা হয়। শাড়ি পরিধান করে মাথায় একটি ঘটি রাখা হয় তাতে জলপূর্ণ করে আম্রপল্লব দিয়ে এক গোছা ধানের গাছ বা কোথাও কোথাও ধানের শীষ দেওয়া হয়ে থাকে। সূর্য দয়ের পূর্বে লক্ষী নাচ সম্পন্ন হয়ে থাকে। লক্ষী নাচের বো লা মো দেব কোটাল পাঠ করে-

“কুণ্ঠে হতে এইলা হায়া আরো ধায়া। [২]

কিসের লাগিয়া তুমি আছো হে বসিয়া।।

স্বর্গ থেকে এলাম আমরা শিব ধাওয়াইয়া।। [২]

বেল পুষ্পের লাগিয়া আছি হে বসিয়া।।”^{৪৪}

ব্রহ্মা নাচ : নিরামিষ খেয়ে থাকবে এমন দুজন ভক্ত ব্রহ্মা নাচ নাচবে। এখানে দেখা যায় দুটো মাটির সরাই মাটি বা বালি ভরে দেওয়া হয়। তার উপর ৫ রকম কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে নাচতে নাচতে গম্ভীরা প্রদক্ষিণ করে।

মশান নৃত্য : শুধু শিবের পূজা হয় না শিব সহচর ভূত-প্রেত মশান সকলেরই দেখা পাওয়া যায় গম্ভীরা উৎসবে।

টেকি চুমানো বা টেকি মঙ্গলা : গম্ভীরা উৎসবের সবশেষে টেকি চুমানো পর্ব হয়। দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরা উৎসবে এই পর্বটি পালিত হয়ে থাকে। টেকি চুমানো অংশে একটি গান প্রচলিত রয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

“টিকি ধান বান্ধেরে রসের কামিনী।

টিকি ধান বান্ধেরে বিন্দনা ছিনারি।।

টিকি আনিলো বীর হনুমানে।

রসের কামিনী টিকি ধান বাঁধেরে।।

খুঁটি দুটি বলে ভাই আমরা দুটি ভাই।

মাটির তলা থেকে কৃষ্ণ গুন গায়।।

টিকির মুলহায়টি বলে আমি করি হাসভস।

কুলাটি বলে ভাই আমি ঝেড়ে উড়াই তুস।।

টিকিটি বলে ভাই আমি নারদের হাতি।

সর্ব দেহ ছেড়ে ভাই আমার পাছায় মারে লাথি।।”^{৪৫}

এই টেকি চুমানো বা টেকিমঙ্গলার কথা ড. প্রদ্যোৎ ঘোষের লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষিনির্ভর বাংলার সমাজে ঘরে ঘরেটেকির মূল্য ও সম্মান অনেক। তাই গম্ভীরা উৎসবে এই টেকিকে খুব সাদরে পূজন করে চুমানো হয়।

হারনা হারনি : ভূতনি, কাটাহা দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরার শেষ পর্ব হল হারনাহারনি পর্ব। এদিন ছোট বড় সকলে নানান বেশে সজ্জিত হয়। কেউ কেউ শিব, রাধাকৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি বেশে তৈরি হয়। আবার সমাজের অন্ত্যয শ্রেণীর চরিত্র ডোম, ডোমনি, হাঁড়ি, মদ্যপানরত পুরুষের চরিত্র, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ছোট ছোট শিশু, রমণী ইত্যাদি বেশে সজ্জিত হয়ে থাকে। পূর্বে এইসব পর্বে কোনো নারীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত না কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষার আলোকে মনের কুসংস্কার কিছুটা দূরীভূত হয়েছে এই গ্রামাঞ্চল গুলিতেও, বলেই বর্তমানে গম্ভীরা উৎসবগুলির কিছু কিছু পর্বে কন্যা শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এইভাবে নানা রূপে সজ্জিত হয়ে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় ও মাঙ্গন সংগ্রহ করে।

পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গান : পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গান নির্দিষ্ট কোনো সময় বা উৎসবে গাওয়া হয় না। বছরের যে কোন সময় যে কোনো সমাজ সচেতনতামূলক সমস্যা সমাধানমূলক অনুষ্ঠানে গম্ভীরার পালাকেন্দ্রিক গান গাওয়া হয়ে থাকে।

মালদহের যে অঞ্চলে পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গানের অধিক প্রচার রয়েছে সে স্থানগুলি হল বামন গোলা, হবিবপুর, গাজোল, কদুবারি, কালিয়াচকের সাঁটাঙ্গা পাড়া, বৈষ্ণবনগর, বীরনগর, বামন গোলা, সামসি, ভালুকা, বালুপুর, তুলসিহাট্টা, মেহা হাট, কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুর, মানিকচক থানার ভুতনি, তাজপুর, পুলিনতলা, মথুরাপুর, রতুয়া থানার নাক কাড়ি মাঠের চরক, আমির চাঁদ তোলা শাহনগর ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে নানান জাতির বসবাস। উল্লেখ্য জনজাতিরা হল - চাঁই গোয়ালা, ছুতার, মাহালী, কিষান, খাওয়ার, কৈবর্ত, রবিদাস, সদগো, কায়স্থ রাজবংশী, ব্রাহ্মণ প্রমুখরা। এক সময় নিম্ন শ্রেণীর জাতিরায় গম্ভীরা গানকে প্রাধান্য দিত। বর্তমানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জাতিরা গম্ভীরা পালাগান ও গম্ভীরা উৎসব উপভোগ করে থাকে।

পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গানের বিভিন্ন পর্যায় : গম্ভীরা উৎসব মালদহকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দান করিয়েছে। গম্ভীরা উৎসব মালদহ জেলার গর্ব, মালদহকে এক অনন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে রেখেছে গম্ভীরা। তথাপি গম্ভীরা উৎসবকে ছাপিয়ে পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গান মালদহ জেলার প্রত্যেকটা জায়গায় আদরনীয়-বরনীয় হয়ে উঠেছে তার সার্বজনীন আবেদন ও সুরবৈচিত্রে। এর নিজস্ব রস রসিকতা নির্মল হাস্যের প্রবাহমান প্রস্রবণে ও তার উপস্থাপনার ভঙ্গিমায় আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন সিনেমার পরিচালকরা আমাদের এই মালদহে গম্ভীরার উপর ডকুমেন্টারি করতে ছুটে আসে। কলকাতা মহানগরের পূজোর থিমে মালদহের গম্ভীরাকে দেখা যায় থিম রূপে। কলকাতার শিল্পীরা অকথ্য পরিশ্রম করে মালদহের বিভিন্ন গম্ভীরা শিল্পীর কাছে গম্ভীরা বিষয়ে বিশদে জানতে ছুটে আসেও এখানকার গম্ভীরাকে তারা ডিজিটাল মাধ্যমে বন্দী করে নিয়ে যায় সুদূর কলকাতা তথা বিভিন্ন জায়গায়। গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে বর্তমানে পালা কেন্দ্রিক গম্ভীরা গান সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গম্ভীরার পালা কেন্দ্রিক গান সকলেই উপভোগ করে থাকে।

ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা’ গ্রন্থে বলেছেন—

“গম্ভীরা গানের ঢং যাত্রার। অনেক লোকগীতিতে অবশ্য যাত্রার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। ময়মনসিংহ গীতিকা মনসার ভাসান ইত্যাদি গম্ভীরার দোসর। কোনটি অগ্রজ এ বিচার করা কঠিন। তবে গম্ভীরার এই যাত্রার ঢঙও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ঘটেছে বলে ময়মনসিংহ গীতিকা মনসার ভাসান ও চন্ডী মঙ্গল ইত্যাদি তাকে প্রভাবিত করেছে - একথা বলা যায় নি:সন্দেহে বলা যায়।”^{৬৬}

লেখক স্বপন মুখোপাধ্যায় তাঁর গম্ভীরার, অতীত ও বর্তমান গ্রন্থে গম্ভীরা গানের সুর সম্পর্কে গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মত তুলে ধরছেন -

“বর্তমান গম্ভীরা গানের আদিরূপ আলকাপের। অনেক আলকাপ গায়ক পরে মুখ্যত গম্ভীরা গায়ক, লেখক হিসেবে থেকে গেছেন। ষাট সত্তর বছর আগে ইংরেজ বাজার থানার অমৃতি গ্রামের লোহা রাম খলিফার সুর ও অন্যান্য দলের উপভোগ্য সুরগুলি সমন্বয়ের মাধ্যমে আজকের প্রতিষ্ঠিত সুরের জন্ম। এর কারণ হিসেবে বলা যায় বিখ্যাত আলকাপ দলের অনুষ্ঠান শুনে তার সুরগুলি গম্ভীরা শিল্পীরাও তাদের সুরে গ্রহণ করেছেন।”^{৬৭}

বর্তমানের গম্ভীরায় ঠিক কোন সুরের প্রাধান্য রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মালদহ জেলার খ্যাতনামা গম্ভীরা দল ফতেপুর গম্ভীরা দল এর কর্ণধার দলনায়ক হাই স্কুল শিক্ষক শ্রী বাবলু মন্ডলের মুখে শোনা যায়-

“হয়তো একসময় গম্ভীরা গানের একটা নিজস্ব সুর ও ভাষা ছিল কিন্তু বর্তমানে ডোমনি, খন, আলকাপ, মনসাগান, কীর্তন ইত্যাদি গানের সুর ও অঞ্চল বিশেষে খোঁটা ভাষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।”^{৬৮}

গম্ভীরা পালা গান করার সময় আদ্যুগে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত কেবল ঢোলক, করতাল। আর বর্তমানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করতে বিভিন্ন গম্ভীরাদল বিভিন্ন ডিজিটাল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো হল - হারমোনিয়াম, বাঁশি, ট্রাম্পেট, ক্যাসিও, করতাল, ঢোলক, খঞ্জনি, দোতারা ইত্যাদি। তবে একথাও বলা যায় কোনো কোনো গম্ভীরা দলের নিজস্ব স্বাদ সজ্জা বাদ্যযন্ত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কালিয়াচক শাহাবাজপুরের গম্ভীরা দল জয়গুরু গম্ভীরা সম্প্রদায়ের দলনেতা, গান রচয়িতা অসিতকুমার মন্ডল তাঁর দলের বাদ্যযন্ত্রের দৈন্যতার সম্পর্কে বলেছেন -

“আমার দলে বেশি বাদ্যযন্ত্র নেই এমনকি দলের একটা হারমোনিয়ামও নেই। আমার নিজস্ব হারমোনিয়াম রয়েছে সেটাকেই যেখানে যায় সেখানে নিয়ে যায়। তবে দোতারা, ট্রাম্পেট, ধোলবাসি ইত্যাদি আছে। বাঁশের বাঁশি আমি নিজে বানাই।”^{১৯}

পালাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গানের বিভিন্ন পর্যায়—

- ১) গম্ভীরা বন্দনা
- ২) চার ইয়ারি
- ৩) ডুয়েট
- ৪) রিপোর্টিং
- ৫) টনটিং

১) গম্ভীরা বন্দনা অংশ : বন্দনা অংশে তিন থেকে পাঁচ জন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এই পালাটি সম্পূর্ণ করতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে। একজন শিব সাজে, মাথায় জটা, এক হাতে ত্রিশূল, এক হাতে ডমরু, পরনে থাকে বাঘছাল। এছাড়াও আরও তিনজন ছেঁড়া ধুতি, গেঞ্জি পরিধান করে। এই ছেঁড়া কাপড় পড়াটা হল দারিদ্রতার প্রতীক চিহ্ন। শিব যেন সরকার। এই সরকারের কাছে নানান সামাজিক রাজনৈতিক পারিবারিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এই দরিদ্র জনগণ। শিব এখানে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর রূপক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। শেষের সকল সমস্যার শোনার পর সেই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মঞ্চ পরিভ্রমণ করে শিব। জনশিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা প্রদান করে থাকে গম্ভীরা গান। শিবকে উপলক্ষ্য করে বন্দনা গান—

“কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায়না অন্ন
হাই কিরে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরিব দুখী আছিলো সুখী
টাকায় আঁট মনের ভাউ চাউল হে
কুনঠে (কোথায়) গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেও ভাউ জুটে না,
দুবেলা প্যাটে ভাত জোটে না,
তোর নন্দী ভিরঙ্গী বুড়হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পূজবো, কয়েক হামরা শিব হে।
বছর বছর আসিস কেন
দ্যাশচ্ লক্ষ্মী ছাড়া শস্যশূন্য।”^{২০}

২) চার ইয়ারি বা চারিয়ারি : এই পর্বে চারজন চরিত্র থাকেন। কোনো একটি সমস্যা বা ঘটনাকে নিয়ে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শেষে উচিত বক্তা শেষ সমাধান সূত্র বা পথ খুঁজে বের করেন। এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জনমত প্রতিফলিত হয়। চারিয়ারি অংশটি গম্ভীরা গানের একটি বড় অংশ। এই পর্ব পরিবেশন দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এক একটি বিষয়বস্তু হয়ে গেলে মধঃ যাতে ফাঁকা না থাকে তার জন্য প্রয়োজন মত সেই সময়ে ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য একটা শিশু বা বালিকা শিল্পী প্রদীপ বা আঙুন হাতে খেলা দেখায়। জনতার মনোযোগ ধরে রাখতে। বিরতির মাঝখানে যে গান গাওয়া হয় তাকে ‘ছুট’ গানও বলা হয়।

প্রবীণ গম্ভীরা শিল্পী গোপীনাথ শেঠ কর্তৃক রচিত চারিয়ারীর একটি গান উল্লেখ করা হল-

“পরিচয়।

১ম - মজুতদার

২য় - ঘুষখোর অফিসার

৩য় - জনৈক গরিব বাঙালি

৪র্থ - ফেল করা মন্ত্রীর স্ত্রীচ

১)

১। আমি মজুদ দার করে চোরা কারবার

ভালোই করেছি লাভ কুড়ি বছরে

২। মা লক্ষ্মীর কুপায় ঘুষের টাকায়

অভাব নাই ঘরে

৩। যা ছিল আমার খেয়ে সবই সাবার

৪। ফেলুয়া মন্ত্রীর গিন্নি তালকানা

কি করি উপায় আমায় বলো না

ছেড়ে যেতে প্রাণ চাহেনা।চ

২)

১। গেল সুদিন এলো দূর দিন ভাবে তাই

মজুতদার আর চোরা কারবাড়ী

২। বিনা ঘুষে চলবে কিসে, তাই ভেবে মরি

৩। ২০ বছর ধরে অনাহার অর্ধাহারে

৪। ছিলাম এয়ারকন্ডিশন ঘরে

স্বর্গসুখে তেতলার উপরে

লিফটে চড়ে উঠতাম নামতাম

এখন মইয়ে উঠি কেমন করে?চ

৩)

১। মন্ত্রীদের রকম দেখে মোদের হৃদয় কাঁপে

বোধ হয় জেলখানার আসে নিমন্ত্রণ।

২। যেমন আপনি তেমনি আমি একই দশা এখন।

৩। আমি কাজ করিব খেতে খাবো।

৪। দিল্লি বেনারস আগরা মুম্বাই
ট্যুর করেছি সরকারি খরচায়
সামার ভ্যাকেশন দার্জিলিং এ মন্ত্রী গিন্নিরা ছাড়া চলে নাই।”^{২১}

৩) ডুয়েট গান : ‘ডুয়েট’, অর্থাৎ ‘দ্বৈত’। নারী পুরুষ উভয় চরিত্র এখানে থাকে। একজন পুরুষ সাজে একজন মহিলা চরিত্র থাকে। ডুয়েটে নাটকের অংশের প্রভাব বেশি রয়েছে। নাটকের চরিত্র ঘটনা সমাবেশ ও সংলাপ যে চারটি অংশ আছে লোকনাটক গম্ভীরাতেও তা বিদ্যমান। গম্ভীরার এই ডুয়েট অংশে নাটকের সর্বাসীন রূপকে দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্গভঙ্গি ও বক্তব্যের মাধ্যমে বা সংলাপের মাধ্যমে রঙ্গ রসিকতা পরিবেশিত হয়। বর্তমানে ডুয়েট পালার পরিবেশন ভঙ্গি সময়ের সঙ্গে বদলে চলেছে।

গম্ভীরা ডুয়েট (বিষয়-শিক্ষা, ২০০৬) -

“পুরুষ - শুন তোরে পুতুলের মা, ফারাক্কা চলনা।
ফারস্ট হয়েছে হামার বেটি দুই জেলাতে
প্রথম প্রাইজ নিতে ছাড়বো না।
স্ত্রী - তোমার মত মোটা হুঁশ দেখিনি কোনদিন
প্রাইভেট স্কুলে লেখিয়া পরিয়া সব হবে লীন
মেয়ের ভবিষ্যৎ হবে ক্ষীণ।
সরকারি স্কুলে ভর্তি করব অল্প পয়সায়
প্রমাণপত্রের মূল্য বুঝনা।
পুরুষ - সরকারি স্কুলে লেখা পড়া কতটুকু হয়
সময় মতো আসে না শিক্ষক
জানো যে নিশ্চয়ই তোমার বলতে কেন ভয়।
স্ত্রী - ডি ডি পি ই পি র -মাধ্যমে স্কুল সাজিয়েছে।
এস. এস. কে., সি. ই. সি আর বি. সি. সি হইছে
আবার আই. সি. ডি. এস আছে।
বহু বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাইছে
তা কি, তুমি জানো না।”^{২২}

৪) রিপোর্টিং বা খবরা খবর : বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ঘটনাগুলো বিবৃত হয়। এই রিপোর্টিং অংশে এছাড়াও সমাজের দুর্নীতি, অন্যায়, বঞ্চনা, অবহেলা অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলী বা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় তা গানের মাধ্যমে রিপোর্টিং আকারে ব্যবহৃত হয়। ওল্ড মালদহের মহাদেবপুর গ্রামের গম্ভীরা শিল্পী ও রচয়িতা নির্মল কুমার দাস কর্তৃক রচিত একটি রিপোর্টিং গান-

“হে নানা! পড়েছি আমরা আচ্ছা ঘূর্নিপাকে
হইয়া দিশাহারা ত্যানা চোরা ঘুরছি কুমারের তাকে।
চোখের জলে কত মা বহিন করে হাহাকার
স্বামী সন্তান হারিয়ে এখন অকুল পাথার
ছারখার হলো কত সংসার।
কত ভারত সন্তান দিয়া নিজের জান
রক্ষা করে ভারত মাকে।। হে নানা...।।

হয়্যা এক্সিডেন্ট গাইসালেপ্লেন কান্দাহারে
বাস মেক্সিতে করে কলিশন এই হবিবপুরে
কত জীবন গেল বেঘোরে।
এখন করে স্মরণ শ্রী হরিচরণ
প্রাণ পাখি উড়বে কোন ফাঁকে।। হে নানা...।।
আম ধান সবই গেল ঝর আর বাদলে
ছানি পানি হারিয়া এখন পড়্যাছি ফাঁপরে
সহেনা মাগের জ্বালা বাপরে।
কচুর কারবার অমর মাস্টার
অ্যাসিস্ট্যান্ট করেছে দুলালকে।। হে নানা...।।”^{২৩}

উক্ত গানটির মধ্যে দিয়ে সমাজে অন্যায্যকারী চোরাকারবারি ব্যক্তিদের কাণ্ডকারখানা পরিস্ফুট হয়েছে রিপোর্টিং আকারে।

৫) **টনটিং** : ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বা বক্রভাবে সমাজের কিছু শ্রেণীর মানুষের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা দেশীয় নেতাদের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরা হয় টনটিং পর্যায়ে। এখানে দুটি চরিত্র থাকে। এই পর্যায়ে সমাজের মুখোশধারী ভুল ব্যক্তির চরিত্রকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিটি কোনো অসামাজিক কাজ করতে ভয় পায়। এইভাবে সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনের ব্যথা, বেদনা, প্রতিবাদী ভাবনা ফুটে উঠে গম্ভীরা শিল্পীর কণ্ঠে।

সাম্প্রতিক সময়ে গম্ভীরা উৎসব নয়, গম্ভীরা পালাগান সারা বছর যেকোনো সময় মালদহ জেলা তথা জেলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানের গম্ভীরা শিল্পীরা গম্ভীরা গান পরিবেশন করার জন্য শুধু জেলা নয়, রাজ্য নয়, রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক পায়। এ যেন মালদহ বাসীর গর্ব গম্ভীরা শিল্পীদের গর্ব। জেলার গম্ভীরা শিল্পীদের আশ্রয় চেপ্টায় গম্ভীরা গান উচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। এক সময় কেবলমাত্র সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরাই গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে গম্ভীরা গান করত। কিন্তু বর্তমানে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বহু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন চাকুরীরত ব্যক্তি গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে গম্ভীর মঞ্চে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেছে। মালদহের স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি গম্ভীরা গানের দল রয়েছে। যেমন— প্রশান্ত সেঠ গম্ভীরা সম্প্রদায় ফুলবাড়ী, সাংস্কৃতিক অশেষা গম্ভীরা সম্প্রদায়, লুক্কক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস, চরী অনন্তপুর গোলাপগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ গম্ভীরা দল, ফতেপুর গম্ভীরা দল - বাবলু গম্ভীরা, চেতনা গম্ভীরা সম্প্রদায় গাজোল, যাদবনগর মহিলা গম্ভীরা সম্প্রদায়, ওল্ড মালদহের মহিলা গম্ভীরা সম্প্রদায় প্রমুখ গম্ভীরা দলগুলো সারাবছর ধরে প্রফুল্ল চিত্তে গম্ভীরা গান করে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে গম্ভীর ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে উক্ত শিল্পী ও শিল্পী দলের অবদান অনস্বীকার্য।

Reference:

১. ঘোষ, প্রদ্যোত, ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা; পুনর্বিচার,’ পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৪১৪, পৃ.-৩
২. পালিত, হরিদাস, পাল, ড. ফনী সম্পাদিত, ‘আদ্যের গম্ভীরা’, মালদা বুক কর্ণার, মালদা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৯, মালদা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, পৃ. -xii
৩. তদেব, পৃ. ১০
৪. সাক্ষাৎকার - মন্ডল, কানাই, বয়স- ৪৭, গ্রাম- বালুপুর কিষণ পাড়া, রতুয়া, তারিখ- ২৯/০১/২০২৩
৫. তদেব

৬. ঘোষ, প্রদ্যোত, 'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা; পুনর্বিচার' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - নববর্ষ ১৪১৪, পৃ. ৩৪
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. সাক্ষাৎকার - মন্ডল, কানাই, বয়স- ৪৭, গম্ভীরাভক্ত, বালুপুর কিষণ পাড়া, তারিখ- ২৯/০১/২০২৩
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. তদেব
১৩. ক্ষেত্রসমীক্ষা- মন্ডল, প্রভঞ্জন, পেশা শিক্ষকতা, বয়স- ৪৭, বালুপুর কিষণ পাড়া, রতুয়া, তারিখ- ১৩/০৪/২০২৪
১৪. তদেব
১৫. সাক্ষাৎকার- মন্ডল, কানাই, বয়স- ৫০, গ্রাম-বালুপুর কিষণ পাড়া, রতুয়া, তারিখ- ২৯/০১/২০২৩
১৬. ঘোষ, প্রদ্যোত, 'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নববর্ষ ১৪১০, পৃ. ৭৮
১৭. মুখোপাধ্যায়, স্বপন, 'গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান', লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃ. ২৮
১৮. সাক্ষাৎকার- গম্ভীরা শিল্পী মন্ডল, বাবলু, দলের নাম- ফতেপুর গম্ভীরা দল, তারিখ- ০৫/০৪/২০২৩
১৯. সাক্ষাৎকার- মন্ডল, অসিত কুমার, দলের নাম- জয়গুরু গম্ভীরা সম্প্রদায়, শাহাবাজপুর কালিয়াচক, তারিখ- ১১/০৪/২০২৩
২০. ঘোষ, প্রদ্যোত 'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা; পুনর্বিচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ; নববর্ষ ১৪১০, পৃ. ৮২
২১. ঘোষ, প্রদ্যোত, 'গম্ভীরা লোক সংগীত ও উৎসব একাল ও সেকাল', চক্র অ্যান্ড কোং, ৬৪ বি প্রতাপাদিত্য রোড কলকাতা ২৬, পৃ. ৭১
২২. সাক্ষাৎকার- পাণ্ডে, অনিল কুমার, পেশা- শিক্ষকতা, গম্ভীরা শিল্পী ও রচয়িতা, বয়স- ৬০, তারিখ- ১০/০৩/২০২৪
২৩. মুখোপাধ্যায়, স্বপন; 'গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান', লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃ. ১৭৭